OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 60 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 60 - 67
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

তারাপদ রায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে স্মৃতির ব্যবহার

মাম্পি দেবাংশী
গবেষক
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mampi02021993@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
short story, memory, Bangladesh, passion for motherland, eternal character, love of animals, childhood, honoring ancestors.

Abstract
Tarapada Roy was born in Elasin village in Tangail, British India (now Bangladesh). Tarapad Roy moved to Calcutta in 1951 after passing matriculation from Bindubasini High School in Upper Bengal. Graduated in Economics from Central Calcutta College (now Maulana Azad College). He taught for a while in a school in Habra, North Twenty-four Parganas, later joined the government service. After leaving Bangladesh at the age of fifteen, Pakapaka never lived there again. It is true that he has adopted Kolkata with love, but he could not forget his golden Bangladesh. Therefore, Opar Bengal has come up again and again with its extraordinary beauty in his story. Inside, he is a very funny person, telling one story after another while chatting. In apparent few words, Gurudarshan has said, a different way of looking at life.

In several stories of Tarapada Ray, we see the multidimensional form of memory. He has skillfully used various memories in the stories like 'Kalukak', 'Garjan Tel', 'Sindoore Megh', 'Amar Amar' etc. Although he left the country at a very young age, he never forgot his country, cherished that country in his lifelong memory. In these stories, I will try to show how the memory of the old life remains in the corner of his mind like a tree uprooted, which he seems to have forgotten, but in a small connection, one after another, like a movie reel, flashed in front of his eyes. Charupisima, Rangakaka, Grandma - these timeless characters of our society bring alive the happy memories of the narrator's life. Kalukaka, Bachur Akha, Vastusapa Dudhraj – subhuman animals have become human in their eternal loyalty and unconditional love for humans. Although most of his life is in Calcutta, Tarapad Roy has kept Bangladesh in his heart. How these stories have become autobiographies full of small words of the village, the country, the people of the country left behind by the writer — hence the subject of this article.

Discussion

বাংলা সাহিত্যধারায় যে সমস্ত রচনাকার নিজ প্রতিভাগুণে স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম তারাপদ রায় (১৯৩৬ – ২০০৭)। কবিতার পাশাপাশি ছোটগল্প, রম্যরচনা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধের জগতেও তাঁর অবাধ

বিচরণ। রসিকতা পরায়ণ এই লেখকের গল্পে সাবলীল ভাবেই হিউমার এসেছে, পরিহাস মিশ্রিত তিক্তরস পরিবেশনে তিনি নিপুণ শিল্পী। তবে তিনি কেবলমাত্র হাসির গল্পেরই লেখক নন। তারাপদ রায় জন্মেছিলেন ব্রিটিশ ভারতের (অধুনা বাংলাদেশের) টাঙ্গাইল শহরের এলাসিন গ্রামে। ওপার বাংলার বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে **১৯৫১** সালে তারাপদ রায় কলকাতায় চলে আসেন। সেন্ট্রাল কলকাতা কলেজ (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক হন। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়ার একটি বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন, পরবর্তীতে যোগ দেন সরকারি চাকুরিতে। পনেরো বছর বয়সে বাংলাদেশ ছেড়ে আসার পর কখনো পাকাপাকিভাবে সেখানে আর থাকা হয়নি। কলকাতাকে তিনি ভালোবেসে আপন করে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ভুলতে পারেননি তাঁর সোনার বাংলাদেশকে। 'তোমার প্রতিমা' কাব্যগ্রন্থে তাই প্রবাস জীবন সম্পর্কে তিনি লিখছেন-

> "একক প্রবাসী আমি।
> এ জীবন যেন এক অনন্ত প্রবাস;
> আমি একা একা যক্ষ
> দীর্ঘ বহুকাল নির্বাসিত।"[১]

তাঁর গল্পে অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে বারবার উঠে এসেছে ওপার বাংলা। ভিতরে ভিতরে তিনি খুবই মজার মানুষ, আড্ডাচ্ছলে বলে গেছেন একের পর এক গল্প। আপাত লঘু কথার মধ্যেই বলে নিয়েছেন গুরুদর্শন, জীবনকে দেখার অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গি।

জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানে প্রত্যেক মানুষের প্রতি মুহূর্তে জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা, যা এক মুহূর্তের মৃত্যু থেকে আর এক মুহূর্তের জন্মের পরিক্রমণে জমা হতে থাকে, সেই অতীত অভিজ্ঞতার ফসল থেকে জন্ম হয় স্মৃতির। একভাবে বলা যায়, মৃত মুহূর্তদের একত্রীকরণে জন্ম হয় স্মৃতির। স্মৃতি হল অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার পুনরুদ্রেক তথা অতীত অভিজ্ঞতার পুনঃস্মরণ প্রক্রিয়া। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া অতীতের ঘটনা বা বিষয় আমাদের মনের অবচেতন স্তরে রয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় -

> "মনের এই অবচেতন স্তর থেকে পূর্ব অভিজ্ঞতাকে চেতন স্তরে পুনরুদ্রেক করাই হল স্মরণ ক্রিয়া (Process of memory) তথা স্মৃতি (Memory)."[২]

অর্থাৎ বলা যায় কোনো অভিজ্ঞতা একবার অর্জনের পর যখন আবার সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করা হয় সেই স্মরণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় চলে স্মৃতি। আর এই স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে উঠে আসে বিস্মৃতির কথা। বিস্মৃতি ঘটে স্মৃতির অভাবে। অতীত অভিজ্ঞতার সবকিছুই কি আমাদের মনে থাকতে পারে? যেটুকু আমাদের মনে থাকে সেটুকু স্মৃতি আর বাকিটা বিস্মৃতি। স্মৃতি ও বিস্মৃতির সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে আছে কল্পনা। স্মৃতি থেকে যে অংশ হারিয়ে যায় সেই অংশ লেখক কল্পনা দিয়ে ভরে নেন। কল্পনায় অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বা ভাবমূর্তির সঙ্গে সময়ের পার্থক্যে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সংযোজন ও বিয়োজন করে লেখকের মনের মধ্যে নতুন নতুন চিত্র অঙ্কিত হতে থাকে। স্মৃতি বা স্মৃতিকথা কথা হল অনেকটা ধারণা ও কল্পনার সংযুক্ত রূপ। স্মৃতিকথার মুখ্য বিষয় রচনাকারের স্মৃতিরোমন্থন। মানুষ বাঁচে বর্তমানে, কল্পনা করে ভবিষ্যতের কিন্তু অতীতকে নিয়ে যখন কথা বলে তখন তা হয়ে যায় কারণ স্মৃতিচারণ। এর মাধ্যমে ফেলে আসা জীবনকে মানুষ মগ্ন চোখে দেখে। তবে স্মৃতির রচয়িতা স্মৃতিকে হুবহু লিপিবদ্ধ করেন না। রচনাকারের অন্তর্চেতনায় চলে বিশেষ ঝাড়াই-বাছাই পর্ব। তাই স্মৃতিকথায় অতীত অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে গিয়ে মূল প্রতিরূপের চড়তে থাকে কল্পনার রং। রচয়িতার একান্ত ব্যক্তিগত অভিরুচিতে নির্মিত হয় স্মৃতিকথা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে পড়ে যায় -

> "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানিনা কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 60 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> সে আপনার অভিরুচি -অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। ...বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।"[৩]

তারাপদ রায় তাঁর গল্পবইয়ের ভূমিকায় লিখছেন-

> "কয়েকটি গল্প প্রায় পুরোপুরি স্মৃতিকথা। তবু গল্পসামগ্রেই রেখে দিলাম, গল্পে আর স্মৃতিকথায় কতটুকুই বা পার্থক্য।"[৪]

সত্যিই তাই। তাঁর গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে এ কথার মর্মার্থ আর সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'চাঁদ ধরার মন্ত্র' গল্পে কংক্রিটের শহর কলকাতা থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে কথক ফিরে গেছেন অতীতে। পাথরের থালার জলে চাঁদকে বন্দী করার গল্প বলতে গিয়ে তিনি যেন মনের মধ্যে আগলে রাখা শৈশবকেই একবার স্পর্শ করতে চেয়েছেন। গল্পের শুরুতেই পাই চারুপিসিমার কথা, যার নামের সঙ্গে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় কদমছাঁট চুল আর সাদা থান একটু একটু করে মনে আসলেও মুখটা ঠিক মনে পড়ে না, মনে পড়ে না তার চেহারা। তাহলে কী মনে পড়ে? ওপার বাংলার এই প্রতিবেশিনীর কাছে শেখা চাঁদ ধরা, তারা বাঁধার মন্ত্র। সন্ধ্যাবেলা চারুপিসিমা মা-কাকিমাদের সঙ্গে পুবের বারান্দায় বসে গল্প করার ফাঁকে ফাঁকেই শিখিয়ে দিতেন কীভাবে দু'দণ্ড অর্থাৎ পৌনে এক ঘন্টার মত চাঁদকে কালো পাথরের থালার জলে বন্দী করে রাখা যায়। মধ্য বাংলার নদী-জলার দেশে প্রায় সারা বছরই বর্ষা, বর্ষা শেষ হয়েও বৃষ্টি থামে ন। কার্তিক-পৌষ মাসেও বৃষ্টি এলে সহজে বিরাম হত না। ওদেশে তাই প্রচলিত ছিল সূর্য 'হেসে যায় কেঁদে আসে' কথাটি অর্থাৎ আজ হাসতে হাসতে সূর্য ডুবল, কাল অঝোর বৃষ্টিতে সকালবেলা ফিরবে। এর প্রতিকার ছিল তারা বাঁধা। চারুপিসিমার শেখানো এই অব্যর্থ মন্ত্রে কোনো অনাচার না করলে পরদিন সকালে আর বৃষ্টি হত না। ভোরের আকাশে সূর্য হাসতে হাসতে ফিরে আসত। চাঁদ-চন্দ্র-চন্দ্রমা মন্ত্রে তারার মত আকাশে চাঁদও আটকে যেত। লেখকের ভাষায় একেবারে নট-নড়ন-চড়ন-নট-ফট। এইসব শখের কাজের সুখের দিন পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। চাঁদ ধরা, তারা বাঁধার এসব কথা লেখক ভুলেও গেছেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। তবু বাড়ির পাশের জমিতে যখন উঁচু উঁচু বাড়ি উঠে যায়, ঘরে জ্যোৎস্নার আলো ক্ষীণ হয়ে আসে তখন মনে পড়ে যায় পূর্ব বাংলায় ফেলে আসা সেই চাঁদ সেই তারা সেই আদিগন্ত আকাশের কথা। গল্পকার লিখছেন -

> "আমি আর কী করতে পারি! এ শহরে আমাকে কে আর জ্যোৎস্নার ইজারা দেবে? মন খারাপ করে বিছানায় শুতে আসছিলাম হঠাৎ ছোটবেলার সেই চাঁদ ধরার কথা মনে পড়ল।... চাঁদটার দিকে তাকিয়ে পরপর তিনবার মন্ত্রটা পড়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। আজ শেষবারের মতো চাঁদটাকে দু দন্ডের জন্য জানালায় ধরে রাখলাম। এই শেষ।"[৫]

গল্পটি শেষ হচ্ছে এক দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে, তার মধ্যে মিশে আছে ধরে রাখতে চেয়েও ধরে রাখতে না পারার কষ্ট, হারিয়ে ফেলার বিষন্নতা। সোনার বাংলার প্রকৃতি ঘেরা বাড়ি ছেড়ে এসেছেন বাল্যকালে। পরিণত বয়সে ইট-কাঠ-পাথরের শহরের যেখানে আকাশছোঁয়া প্রাসাদের কৃত্রিমতার ভিড়ে আর বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া হয় না সেখানে বসে মনকেমনের গল্প শুনিয়েছেন গল্পকার।

আমাদের পরবর্তী আলোচ্য 'কালুকাক' গল্পটি। আপাতভাবে গল্পের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, কালু নামের জন্মান্ধ কাককে নিয়ে এই গল্প, কিন্তু গল্পের শেষ অংশে রয়েছে অন্য চমক। সাধারণ একটা কাক অব্যক্ত তীব্র যন্ত্রণার প্রতীক হয়ে উঠেছে তারাপদ রায়ের এই গল্পে। লেখকের এলাসিনের বাড়ির ভাঁড়ার ঘরের পিছনে এক আদ্যিকালের বিশাল মহানিম গাছের ডালের বাসায় জন্মেছিল কালু নামের কাকটি। কাকেদের সমাজব্যবস্থা নিষ্ঠুর, কোনো অসদাচারি পঙ্গু বা দুর্বল সঙ্গীর প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র মমতা থাকে না। জন্মান্ধ এই কালুকেও তার সঙ্গীদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছিলেন গল্পকার তথা কথকের বড় ঠাকুমা। কালুর ঠাঁই হয় দালানের পিছনের বারান্দার কোণে রাখা পুরনো আসবাবপত্রের একটা ছেঁড়া তুলো গদিওয়ালা চেয়ারে। আহ্লাদি নামের গরু, ভোলা নামের কুকুর ও রুপো নামের সাদা বিড়ালের সঙ্গে কালুকাকও কথকের বাড়ির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। খিদে পেলে বড় ঠাকুমার ঘরের জানলার নীচে গিয়ে ডাকে, বাড়ির উঠোনে

লোক ঢুকলে কঃ কঃ আওয়াজ করে সকলকে সজাগ করে দিত এরকম নানা সংকেত আওয়াজ ছিল তার। এমনকি গল্পকার বাড়ি ফিরলে কালু তার কর্কশ কণ্ঠ যথাসাধ্য মোলায়ম করে অভ্যর্থনা জানাত। কিন্তু একদিন এক ফকির এসে তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে কালুকে ভূশণ্ডির কাক, ত্রিকালজ্ঞ পাখি বলে ঘোষণা করে বসল। এখানেই সমস্যার শুরু। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ভূত ভবিষ্যৎ সব কালুর জানা - কথাটা পাঁচ কান হয়ে চাউর হতেই ভিড় জমা হতে থাকে কথকের বাড়িতে। এরই ফলস্বরূপ একদিন রাতে হঠাৎ চুরি হয়ে যায় কালু। থানা পুলিশ করেও তাকে পাওয়া যায় না। হঠাৎ তিন বছর পর সন্তোষের রথের মেলায় এক জ্যোতিষীর সঙ্গে তাকে দেখতে পান কথক। কালুর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা তাঁকে চিনিয়ে দেয় সাধারণের মধ্যেও বিশেষ কালুকে, নাম ধরে ডাকতেই সে সাড়া দেয়। কিন্তু তিন বছর আগের আর পরের সময় কি এক আছে? এই কয়েক বছরে পাল্টে গেছে মানুষের বর্তমান ভবিষ্যৎ। দেশভাগ নামক অভিশাপ এক মুহূর্তে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে সবকিছু, তছনছ করে দিয়েছে মানুষের আশা-স্বপ্ন-ভালোবাসা। নিজেদের ভিটেমাটিতে সবাই এখন পরগাছা। তাই কথকের ডাকে গলা নরম করে যখন কালু সাড়া দেয় তখন তিনি কী করবেন? এলোমেলো ছন্নছাড়া জীবনের ছবি আঁকতে গল্পকার লিখছেন -

> "এখন বড় ঠাকুমা মারা গেছেন। দেশ ও ভাগ হয়ে গেছে। আমরা কে কোথায় যাব তারও ঠিক নেই। আমাদের সংসানে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। আমি আর কালুর ব্যাপার নিয়ে উচ্চবাচ্য করলাম না। ধীরে ধীরে মেলার ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। মেলার অত লোকগুলির মধ্যে কালুর ক ক ক ক ডাক আমার পিছে ঘুরতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি মেলা থেকে বেরিয়ে এলাম।"[৬]

গল্পকার পালিয়ে এলেন, যেখানে নিজেদের স্থিতির কোনো নিশ্চয়তা নেই সেখানে কালুকে কোথায় ঠাঁই দেবেন? দেশভাগের অনিশ্চয়তা কালুকে আলাদা করে দিয়েছে পরিবার থেকে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় 'জ্যাকব' গল্পে লেখকের প্রিয় সেই ঘোড়ার কথা, যে রিফিউজি হয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্ত চৌকির তারকাঁটার বেড়া আর পেরোতে পারেনি, মৃত্যু পর্যন্ত উদাস অতল কালো চোখে তাকিয়ে থেকেছে সীমান্তের দিকে। ঈশ্বরের তৈরি পৃথিবীতে মানুষের মাপজোখের বিভাজন। 'কালুকাক' গল্পটি মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি অগাধ ভালোবাসা থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে দেশভাগের যন্ত্রণায়। আসলে দেশভাগের ভাঙন সবার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে মায়া মমতাকে, তার শিকড়কে ফেলে আসতে, যৌথতাকে ভালোবাসার টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে মানুষকে বাধ্য করেছে।

সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের একটি গল্প হল 'গর্জন তেল', একে স্মৃতিতর্পণও বলা চলে। ছোটোবেলার কথা বলতে গিয়ে লেখকের মনে পড়ে গেছে দুটি আশ্চর্য গাছের কথা, লেখকের কাছে এই দুটি গাছ নন্দনকাননের পারিজাত তরুর থেকে কম আকর্ষক নয়। একটি বিশাল মহীরুহু হলেও অপরটি বৃক্ষ নয়, গুল্ম। এই মহীরুহ বিরাট গাছটির কোটর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কাঁচা সোনার মতন ঝকঝকে এক তরল পদার্থ যার নাম গর্জন তেল। সাধারণ লোকে যাকে চেনে ঘাম তেল বলে। সচরাচর এই তেল মাখানো হয় প্রতিমার গায়ে, মাখানো মাত্র ল্যামিনেট দেওয়া বইয়ের মতন ঝলমলিয়ে ওঠে প্রতিমা। আমরা জানি নদীর ধারের এক গঞ্জ শহরে শৈশব কেটেছে কথকের। সারাবছরের চাহিদার সবকিছু সেখানে মিলত না। সুদূর কলকাতা-ঢাকা-চট্টগ্রাম থেকে বড় বড় মনোয়ারি নৌকোয় নদীর ঘাটে জিনিসপত্র আসত। সেরকমই এক পশ্চিমা নৌকায় অতিকায় কাঠের পিপেয় গর্জন তেল এসেছিল। চুরি-চামারির ভয় না থাকায় চরের ব্যাপারীরা তা নদীর ধারেই ফেলে রেখেছিল। এ গল্পের প্রধান চরিত্র গল্পকথক ও তাঁর দাদা। তাঁরা তেল ও তেলের ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ভাদ্র মাসের মাঝামাঝিতে একরাতে দুর্গাবাড়ির প্রতিমা বানানোর কুমোরকে তেল চুরি করতে দেখে ফেলেন। তার ঠিক কয়েকদিন পরেই মহালয়ার দিন তাঁদের চোখের সামনে ম্যাটমেটে দুর্গা প্রতিমা ঝলমলিয়ে উঠল সেই গর্জন তেল মেখে। দুর্গা, অসুর থেকে শুরু করে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক এমনকি দুর্গার হাতের সাপ, গণেশের ইঁদুর, অসুরের মোষ পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠল। কথক ও তাঁর দাদা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই গর্জন তেল মাখানো দেখে বুঝতে পারলেন এর কার্যকারিতা। সেদিন সন্ধ্যাতেই এক কান্ড বাধিয়ে বসেন দাদা, কাউকে কিছু না জানিয়ে উধাও হয়ে যান। গর্জন তেল চুরি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 60 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে এনে পরদিন সকালে হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে মনের সুখে সর্ষের তেলের মতন হাতে পায়ে বুকে পিঠে গর্জন তেল মাখেন। এরপর তাঁর অবস্থা আরও শোচনীয়। ঠাকুমা গরম জল সাবান সোডা দিয়ে দু'ঘণ্টার অক্লান্ত চেষ্টায় দাদাকে নিজের স্বরূপে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই ছিল গর্জন তেলকে ঘিরে গল্পকারের ছোটোবেলার অভিজ্ঞতা। এই গল্পে বহু বছর পর গর্জন তেল এবং সেই অনুষঙ্গে দাদার ছেলেমানুষির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কথকের। কেন হঠাৎ লেখকের মনে পড়ল গর্জন তেলের কথা? এর উত্তর আমরা পাই গল্পের শেষে। লেখকরা ছিলেন চার ভাই, তাঁর এই দাদা হলেন শেখর রায়। 'চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি' উপন্যাসের আত্মকথা অংশে তাঁর একমাত্র দাদাকে নিয়ে তিনি লিখছেন -

> "আমার দাদার নাম ছিল খোকন।
> আমারও ডাকনাম ছিল খোকন। প্রথমে শুধু খোকন, পরে ছোটোখোকন।
> পরপর পিঠোপিঠি দুই ভাই। একই মায়ের পেটের, যাকে অভিধানের ভাষায় বলে সহোদর ভাই, আমি আর দাদা তাই।...আমার আর দাদার দুজনেরই যে একই ডাকনাম ছিল শুধু তাই নয়। তার চেয়েও অনেক আশ্চর্যের ব্যাপার, দাদা আর আমি দুজনেই জন্মেছিলাম পরপর দু-বছরে একই বাংলা তারিখে। পয়লা অঘ্রানে এবং একই বার রবিবারে।...দাদা তাই এক বছরের বড়ো হলেও আমার থেকে দু-ক্লাস ওপরে পড়ত। পরে দু-বার ক্লাসে উঠতে না পেরে ফেল করে নাইন টেন নাগাদ আমার সঙ্গে একই ক্লাসে চলে আসে। তখন ইস্কুল বদল করে দাদা অন্য ইস্কুলে চলে যায়।"[৭]

আলাদা স্কুলে পড়লেও পিঠোপিঠি এই দুই ভাই একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। তারাপদ রায়ের বহু গল্পে দাদা চরিত্রটির উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ১৯৫১-তে তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এলেও তাঁর এই অগ্রজ সেখানেই পরিবারের সঙ্গে রয়ে গেছিলেন, পরবর্তীতে টাঙ্গাইলে তাঁর মৃত্যু হয়। এ সম্পর্কে গল্পকার লিখছেন –

> "...প্রায় চল্লিশ বছর পরে টাঙ্গাইলের শূন্যবাড়িতে দাদার মৃত্যু হলে বাবাকেই তার মুখাগ্নি করতে হয়। পরে শ্রাদ্ধও করতে হয়। মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধ করার জন্য কোনো রক্তের সম্পর্কের লোক আর বাংলাদেশে ছিল না।"[৮]

বোঝা যায়, তাঁর ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী প্রাণপ্রিয় দাদা যখন মারা যান তখন গল্পকার দাদার কাছে উপস্থিত ছিলেন না। মৃত্যুর কিছুদিন পরে ডাকযোগে সেই দাদার একটি ফটো আসে, মৃত্যুর পরে খাটে শুয়ে আছেন। আর সেখানেই এই গল্পের উৎস। লেখক বলছেন –

> "হঠাৎ ছবির মধ্যে দাদার মুখটার দিকে তাকিয়ে অনেকদিন আগের এইসব কথা মনে পড়ল। মনে হল, দাদার মুখভরা যেন গর্জন তেল মাখানো রয়েছে, ঝকমক করছে মুখটা।"[৯]

গর্জন তেল মেখে প্রতিমা যেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে গল্পকার তথা কথকের দাদাও যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। খুব কাছের মানুষকে হারিয়ে ফেলার পর তাকে আবার ফিরে পাবার একটা সুতীব্র বাসনা রয়ে গেছে যেন গল্পটির শেষ লাইনে। অনেককাল পুরনো ছোটোবেলার স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে লেখকের দাদা যেন আবার নতুন করে বেঁচে উঠেছেন তাঁর কাছে। আসলে একটা বয়স পর্যন্ত মানবশিশুর মৃত্যুবোধ আসে না। কিন্তু তারপর? মৃত্যু মানে চিরন্তন বিচ্ছেদ, আর কখনো দেখা হবে না এই পৃথিবীতে, এ খুব সহজ বোধ নয়। হাহাকার, বেদনা ও হারিয়ে যাওয়া, চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়ার বোধ আর কোনোকালে দেখা না হওয়ার দুঃখ পরিণত বয়সে পৌঁছে মানুষকে ক্রমশ আয়ত্ত করতে হয়।

আমাদের পরবর্তী আলোচ্য গল্পটি হল 'সিঁদুরে মেঘ', বাংলায় এই বাগধারাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এখানে গল্পের এই নামকরণটি ব্যঞ্জনাপূর্ণ। চাকরিসূত্রে লেখক কিছুদিন হুগলিতে ছিলেন। রেলগাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় হুগলি থেকে কলকাতায় ফিরছেন এমন সময় মাঝপথে জানালা দিয়ে দেখলেন দূরে কোথায় যেন আগুন লেগেছে। আগুনের জিভ বরাবর একটা নীল ধোঁয়া নদীর মত এঁকেবেঁকে আকাশে ভেসে যাচ্ছে। লেখকের মনে পড়ে গেল দশ-বারো বছর বয়সের

কথা, তাঁদের টাঙ্গাইলের বাড়িতে আগুন লাগার কথা। সেদিনের সেই পোড়া পোড়া গন্ধ আজও রেলের জানালায় চকিতে ভেসে এল। ছোটোবেলায় শহরের বাজারে খাঁটি দুধ পাওয়া যেত না বলে গ্রাম থেকে নায়েবমশাই বাছুরসমেত একটা দুধেল গরু পাঠিয়েছিলেন গল্পকারের ভাই বাচ্চুর দুধ খাওয়ার জন্য। গরুর জন্য রান্নাঘরের পিছনে জামগাছের তলায় পাটকাঠির বেড়া দিয়ে অস্থায়ী গোয়ালঘর তৈরি করা হয়েছিল। একদিন সন্ধ্যায় গোয়ালঘরের সাজাল থেকে পাটকাঠির বেড়ায় আগুন ধরে যায়। পাশের বাড়ির প্রতিবেশী দেখতে পাওয়ায় সে যাত্রা সবাই রক্ষা পায়। গরু ও বাছুরের পিঠে কিছুটা অংশের লোম পড়ে যায়। শিশু বাছুরটির প্রতি মায়ার কারণে তাকে রেখে দিয়ে গরুটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেশে। সব ষাঁড়ের মতোই বাছুরটি নাম হয় শিবু। কিন্তু আগুনে পুড়ে তার পিঠের সাদা লোমের নিচে লাল চামড়া দেখা যেত, ঠাকুরমা তাই তার নতুন নাম দিয়েছিলেন আখা। সে পশু হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এলে গল্পকারের দাদা সূর্য ডোবার আগে তাকে পশ্চিম আকাশের কালো মেঘগুলো যখন লালচে হয়ে যায় তখন তাকে গলায় দড়ি দিয়ে বাড়ির সামনের পুকুরের পশ্চিম পাড়ের মাঠে মাঝখানে নিয়ে যেত; দেখত ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে সত্যিই ভয় পায় কিনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আখা কোনোদিনই ভয় পায়নি। এরপর লেখক এক ভয়ংকর সময়ের কথা তুলে ধরেছেন। ১৯৫০-এর দাঙ্গা। নতুন সীমান্তে এপারে ওপারে কলকাতা- ঢাকা-বরিশাল-আসাম সব পুরনো দেশগুলিতে আগুন জ্বলতে লাগল, গল্পকথকের শহরেও সে আগুনের আঁচ এসে লাগে। তাঁদের বাড়ির সামনে পুকুরের ওপারে বিপ্রদাস চৌধুরীর পাকা বাড়ি আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণে গাছপালার মাথার উপর দিয়ে আগুনের নীল ধোঁয়ার নদী বয়ে যাচ্ছে। পশু হলেও এটাই স্মৃতি উস্কে দিচ্ছে আখার। দালানের বারান্দায় ঘুমানো আখা সিনেমাহল কাছারি পার হয়ে ফাঁকা মাঠে নেমে ছুটতে লাগল সে, ছুটতে ছুটতে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল। দাদা বহুবার সিঁদুরে মেঘ দেখিয়েও যা করতে পারেনি সেদিন আগুন দেখে তাই হল। এতদিন পরে কথকের মনে পড়া এই দিনগুলো যেন আশঙ্কার জন্ম দেয়, সে সময়ের দিনকালের প্রেক্ষিতে আবার সিঁদুরে মেঘ তথা দাঙ্গার কথা মনে পড়ে যায় লেখকের। গল্পটি একটি বৃত্তে সম্পূর্ণ হয়েছে। গল্পের শুরু এবং শেষ এক বিন্দুতে এসে মিলিয়ে গেছে। একটি বাগধারাকে কেন্দ্র করে ১৯৫০-এর ভয়ঙ্কর দাঙ্গার স্মরণ করেছেন গল্পকার। এ গল্পে তিনি মনে মনে সেই সময় যেন না ফিরে আসে প্রার্থনা করেছেন।

'অমর অমর' গল্পটি গল্পকারের রাঙাকাকার স্মৃতিতে লেখা। একটি পাখির ডাক লেখককে স্মৃতিবিহ্বল করে তুলেছে। খুব ছেলেবেলায় কথকদের বাড়িতে একটা টিয়া পাখি ছিল, সাধারণ জাতির নয় আজমপুরি টিয়ার ছিল রাজকীয় চেহারা। কথকের ঠাকুমার ভাঙা গলা নকল করে স্পষ্ট কথা বলতে পারত। কিন্তু সে বিশেষ কোনো কথা বলত না, শুধুমাত্র ভোরবেলায় একবার ও সারাদিনে বার কয়েক 'অমর অমর' বলে ডেকে উঠত। আমরাজানি অমর কথকের রাঙাকাকা, একটু উল্টোপাল্টা ন্যালাক্ষ্যাপা ধরনের লোক। তার একটা ধারণা ছিল যে তার মাথা খারাপের সম্ভাবনা আছে। সোনাকাকা সম্পর্কে লেখক তাঁর 'চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি' উপন্যাসে লিখছেন -

> "...ঠাকুরদার আদেশে বাবা আর গজেনবাবু গিয়ে কলকাতার হার্ডিঞ্জ হস্টেল থেকে সোনাকাকাকে বাড়িতে ফেরত নিয়ে এলেন। ...সোনাকাকা বাড়ি ফিরে আসার পর জানা গেল গত ছয়-সাত মাসে এক সপ্তাহ দু-সপ্তাহ মেয়াদে প্রায় তিন-চারবার হাজতবাস করেছে সোনাকাকা। সে সময় এসব ব্যাপার হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। স্বদেশি করে অল্পবিস্তর কারাবাস তখন অনেকেই করেছে, তা ছাড়া ক্রমশই এটা স্পষ্ট হয়ে আসছিল যে ইংরেজ আর বেশিদিন নেই। স্বদেশির জন্যে নয়, কোনো একটা কারণে পুলিশের অতিরিক্ত অত্যাচার কিংবা পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরায় এমনি এমনি সোনাকাকার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।
>
> আমাদের দালানের বাইরে বারান্দায় আগাগোড়া চুপচাপ বসে থাকতেন। মাঝেমধ্যে আপনমনে কী সব বিড়বিড় করতেন। ওদিক কবিরাজ বলে দিয়েছিল বলে দৈনিক সকাল সন্ধ্যায় বাড়ির সামনের পুকুরে গুনে গুনে এক-শো আটটা ডুব দিতেন। ডুব দেওয়ার সংখ্যা গোনার জন্যে সোনাকাকা কখনো কখনো আমাদের পুকুরপাড়ে ডাকতেন। আমরা দুয়েকবার

হিসেবে গোলমাল করার চেষ্টা করে দেখেছি সোনাকাকা ধরে ফেলেছেন। তিনি নিজেও মনে মনে আলাদা করে গুনতেন।"[১০]

এরপর লেখক মজা করেই লিখেছেন -

"আমার নিজের বিশ্বাস সোনাকাকা স্বেচ্ছায় পাগল হয়েছিলেন। এটা কোনো নতুন কথা নয়। পাগল হওয়ার ব্যাপারটা আমাদের বংশে আছে অথবা ছিল। একথা গোপন করার কিছু নেই, আমাদের বংশে যে কেউ একটু ভালো করে চেষ্টা করলে পাগল হয়ে যেতে পারত।"[১১]

'চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি' উপন্যাসের এই অংশেই এই গল্পের বীজ লুকিয়ে ছিল। উপন্যাসের এই সোনাকাকাই রাঙাকাকা হিসেবে ধরা দিয়েছে গল্পে। রাঙাকাকা শহরে বাসাবাড়ি থেকে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন জিনিসপত্র আনতে। তার অবর্তমানে নতুন কাজের লোকের উপর দায়িত্ব পড়ে টিয়া পাখিটিকে দেখাশোনা করার কিন্তু পাখিটি তাকে ঠোকর মেরে উড়ে পালায়। হবিষ্যিঘরের সামনের বারান্দায় তখন শূন্য দাঁড়টা পড়ে থাকে, চৈত্রের বাতাসে পিতলের শিকলটা দাঁড়ের গায়ে দুলে দুলে আঘাত করলে ক্ষীণ একটা টিং টিং শব্দ ওঠে। এই শব্দটির মধ্যে বিষাদের সুরকে গেঁথে দিয়েছেন গল্পকার। রাঙাকাকা বাড়ি ফিরে এসে বিশেষ কিছু জানতে চাননি তবে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, তার প্রিয় পাখিটি মরে গেছে না পালিয়ে গেছে। আমরা দেখি পাখিটি চলে যাওয়ার পর রাঙাকাকার চরিত্রটি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। পাখিটি আর ডাকেন, শেষ রাতে রাঙাকাকাও আর ওঠে না, একশো আটটা ডুব দেয় না, অনেক বেলায় স্নান করে কখনও বা করে না। তারপর একদিন রাঙাকাকা ঘর চাপা পড়ে মারা যায়। আস্তে আস্তে রাঙাকাকার অনুপস্থিতি সবার সয়ে গেছে, টিয়া পাখিটিকেও ভুলতে বসেছে সবাই। একদিন হঠাৎ শীতের ভোরবেলায় সেই পালিয়ে যাওয়া পাখিটার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। ছাদের নীচে কার্নিশে বসে রাঙাকাকার ঘরের জানালার দিকে মুখ করে পাখিটি ডাকছে 'অমর অমর'। তা শুনে ঠাকুমা মালা জপ ছেড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। তারপর থেকে দীর্ঘদিন পাখিটা আসত ঠাকুমাকে কাঁদাতে। এরপর বহু কাল কেটে গেছে। শহুরে বাসা বড়ি ছেড়ে যাবার পঁচিশ–ত্রিশ বছর পর আগাছা জঙ্গলে ভরে যাওয়া বাসাবাড়িটা বিক্রির খোঁজ খবর করতে গিয়ে কথকের হবিষ্যি ঘরের বারান্দার দিকে নজর পড়তে সেই পাখি, রাঙাকাকা, ঠাকুমা সবার কথা মনে পড়ে গেল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বেরিয়ে আসতেই কানে এল ভাঙা গলায় সেই বহু পরিচিত ডাক। ঝকঝকে সবুজ রঙের একটা টিয়া পাখি ছাদে বসে ঘাড় বাঁকিয়ে ডেকে যাচ্ছে 'অমর অমর'। কি আশ্চর্য! সত্যিই কি টিয়া পাখি এতদিন বাঁচে নাকি বংশানুক্রমে সে শিখিয়ে দিয়ে গেছে আর চিনিয়ে দিয়ে গেছে কথকের পুরনো বাড়িটা। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই পাখিটা নিম গাছের উপর দিয়ে বহুদূরে শূন্যে মিলিয়ে যায়। এই গল্পে একটা পাখির সঙ্গে কীভাবে মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সোনাকাকা কথা রাঙাকাকা তা দেখিয়েছেন গল্পকার। মানুষের প্রতি শর্তহীন ভালোবাসায় গল্পে ছোট্ট প্রাণী একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। সেই পাখির ডাকের সঙ্গে লেখকের মন সুদূর অতীতে পাড়ি দিয়ে স্মৃতিভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক আগেই তাঁর 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থে বলেছেন - 'সহজ কথা যায় না লেখা সহজে' কিন্তু গল্পকার তারাপদ রায় ছিলেন এই সহজের অধিকারী, আজীবন সহজেরই সাধনা করেছেন তাঁর লেখায়। অযথা কাঠিন্য আনার পক্ষপাতী তিনি নন। তারাপদ রায়ের উক্ত গল্পগুলিতে স্মৃতির বহুমাত্রিক রূপ দেখতে পাই। খুব অল্প বয়সে দেশকে ছেড়ে গেলেও নিজের দেশকে কখনোই ভুলে যাননি, আজীবন স্মৃতিতে লালন করে গেছেন ফেলে আসা দেশকে। এসব গল্পে পুরনো ভিটের স্মৃতি শিকড় উপড়ানো গাছের মতই তাঁর মনের কোণে রয়ে গেছে, যাকে আপাতভাবে ভুলে গেছেন বলে মনে হলেও ছোট্ট কোনো অনুষঙ্গে সিনেমার রিলের মত একের পর এক স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। চারুপিসিমা, রাঙাকাকা, ঠাকুমা - আমাদের সমাজের এই চিরন্তন চরিত্রগুলো জীবন্ত করে তুলেছে কথকের জীবনের সুখস্মৃতিগুলোকে। এই সমস্ত গল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই হল পশুপ্রেম। কালুকাক, বাছুর আখা, আজমপুরী টিয়া– মনুষ্যেতর প্রাণী হয়েও যেন মানুষ হয়ে উঠেছে মানুষের প্রতি তাদের চিরন্তন আনুগত্য ও শর্তহীন ভালবাসায়। জীবনের সিংহভাগ কলকাতায় থাকলেও শৈশবে ফেলে আসা বাংলাদেশকে বুকের ভেতর আগলে রেখেছেন তারাপদ রায়। এই গল্পগুলি লেখকের ফেলে আসা গ্রাম, দেশ, দেশের মানুষের ছোট ছোট কথায় ভরা আত্মকথা হয়ে উঠেছে। শৈশবের যে পৃথিবী তাঁর ছিল একান্ত চেনা, সেই নদী গ্রাম মাঠ ও আকাশ আর চেনা দিন চেনা অবকাশ; জীবনের দ্বিতীয় প্রহরে

কালান্তরে তা পাল্টে গেছে। আবাস হয়েছে প্রবাস। এখন তাঁর স্বদেশ বিরহে বিপ্রলব্ধা নায়িকার মত তাঁর চেনা দ্বীপে বসে কাঁদে। তবে তিনি আশায় থাকেন দুঃখ যদি কোনোদিন তাঁকে মুক্তি দেয়, স্মৃতি যদি তাঁকে শেষ ছুটি দেয় তাহলে তিনিও একদিন ফিরবেন পাখিডাকা পাতাঝরা পথ ধরে ধরে তাঁর ঘরে। সেই প্রশান্ত গ্রাম তাঁর জন্য এখনো নিশ্চয়ই অপেক্ষায় রয়েছে। জীবনের পূর্ণলগ্নে বেশিরভাগটা সবাই কলকাতায় থেকেও তিনি তাঁর সোনার বাংলাদেশকে বুকে করে আগলে রেখেছেন তারই স্মৃতি সহজ সাবলীলভাবে নিপুন স্বতঃস্ফূর্ততায় ফুটে উঠেছে তাঁর লেখা গল্পগুলিতে। তাঁর স্মরণের পাঁচিলে এই গল্পগুলি যেন লতা হয়ে দুলছে। এই স্মৃতি তাঁর বেঁচে থাকার রসদ, তাই তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন এই স্মৃতিকে বুকে করেই আগলে রেখেছিলেন, গল্পে তিনি নিপুণ হস্তে তারই ব্যবহার দেখিয়েছেন।

Reference:

১. গড়াই, নিমাই (সম্পাদক), প্রবাস, তোমার প্রতিমা, তারাপদ রায় রচনাসমগ্র প্রথম খন্ড, লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০২১, পৃ. ৫৯০

২. রায়, সুশীল, শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ), ২০১৫-২০১৬ (নতুন সংস্করণ), পৃ. ৪৩৭

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সূচনা, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৬, পৃ. ১

৪. রায়, তারাপদ, ভূমিকা, গল্পসমগ্র প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১২, তৃতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৪২৮, পৃ. ৩

৫. রায়, তারাপদ, চাঁদ ধরার মন্ত্র, গল্পসমগ্র প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১, কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৫, পঞ্চম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ২০৬

৬. রায়, তারাপদ, কালুকাক, গল্পসমগ্র প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১, কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৫, পঞ্চম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ২০৮

৭. গড়াই, নিমাই (সম্পাদক), চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি, তারাপদ রায় রচনাসমগ্র প্রথম খন্ড, লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৩ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০২১, পৃ. ২০৭

৮. তদেব, পৃ. ২০৬

৯. রায়, তারাপদ, গর্জন তেল, গল্পসমগ্র প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১, কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৫, পঞ্চম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ২২৭

১০. গড়াই, নিমাই (সম্পাদক), চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি, তারাপদ রায় রচনাসমগ্র প্রথম খন্ড, লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৩ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০২১, পৃ. ১৬২

১১. তদেব, পৃ. ১৬৩